ম্যাগপাই ও ট্র্যাফিকজ্যাম

দিলরুবা শাহানা

বিশাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হঠাৎ করে ঘোষকের কন্ঠে নিজের নাম শুনলে এমন কেউ আছেন কি যার ভয়ে বুক কাঁপবেনা? তাছাড়া ট্রানজিট যাত্রী হিসেবে বসে আছেন এমন সময় যদি বিমানবন্দর সরগরম করে ঘোষক আপনার নাম ধরে হাকডাক শুরু করে তবে ঘটনা কি জানার আগেই ভয়ে নির্জীব হওয়ার কথা।

আমি নিজের নাম শুনে ভয় ততোটা পাইনি। ভয় না পাওয়ার পিছনে কারন অবশ্য একটা রয়েছে। আমি প্রথমেই পাসপোর্ট ও টিকেটটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলাম। এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। নাহ্ যে লোক আমাকে খুঁজতে পারতো তার প্লেনও এই বন্দর ছেড়ে চলে গেছে আধ ঘন্টা আগে। যদিও ঐ লোককে আমি দেখিনি, জীবনে কোনদিন দেখবো বলেও মনে হয়না। তাকে দেখার কোন ইচ্ছেও আমার নাই। তবে এই মূহূর্তে ইচ্ছা একটাই আমার অদেখা, অজানা লোকটি যেন দেশে ফিরে তার মাকে জীবিত পায়।

এটা মোটেও নায্য কথা নয় একজন লোকের বাইশ বছর লাগলো দেশে ফিরতে। কারন প্রয়োজনীয় নথি বা কাগজপত্রে কিছু সমস্যা ছিল। আজ অসুস্থ মাকে দেখতে অস্থির হয়ে ফিরছে সে। তবে আরও অন্যায় যে বাড়ীর কাছে এসেও ২০ঘন্টা তাকে এক এয়ারপোর্টে পরবর্তী ফ্লাইটের অপেক্ষার যন্ত্রনায় নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছিল। কপাল ভাল যে লোকটি বুদ্ধি করে বিমানবন্দরে অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছে আবেদন করেছিল। আর আমার মত উদাসিন মনের মানুষের কানেও তার আর্তি পৌঁছেছিল। মনে হল কি আর হবে আরও যদি ঘন্টা বারো এই এয়ারপোর্টে বসেই থাকি। তাতে যদি একজন মানুষ সামান্য সময় আগেও তার অসুস্থ মায়ের কাছে পৌঁছাতে পারে, তবে তাই হউক।

ঐ ঘোষনা শুনে আমি পায়ে পায়ে কাউন্টারে হাজির হই। ঝামেলা কিছুই হলনা। সে আমার ফ্লাইটে জায়গা পেল আর আমি তার সিট পেলাম পরের ফ্লাইটে। লোকটি টিকেট কাউন্টারে ছিলনা তবে টিকেট রেখে গিয়েছিল। কাউন্টারে বসা মেয়েটি অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখলো। তার চোখের ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছিল আমাকে যে কেবল বেকুবরাই এমন কাজ করে । এয়ারপোর্টে বসে থাকার মতো বিরক্তিকর কাজ যেচে নিজের কাঁধে নেয় বোকারা। বোধহয় আমি বোকা মতই মানুষ নাহলে এই ঝামেলাতে কেন গেলাম কে জানে?

গম্ গম্ করে উঠলো ঘোষকের কণ্ঠ। এই নামের অমুক ফ্লাইটের যাত্রীকে টিকেটসহ একটি ডিউটি ফ্রি শপের কাউন্টারে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এবার ঘোষক 'লা স্পানিওলা' বলে স্প্যানীয় ভাষায় ঘোষনাটি বললো। তারপরেই 'পার্‌লে ফ্রান্সিয়া' বলেই ফরাসীতে অরুণা আজিজকে ঐ দোকানে যাওয়ার অনুরোধ।

আমি এর আগেও পাশে বসা দম্পতির হেফাজতে আমার কৌচে জার্নালটা রেখে ঐ টিকেট বদলানোর পরোপকারিতা করতে গিয়েছিলাম। আসলে জার্নাল রেখে এইরকম একটি সুবিধাজনক জায়গায় পাওয়া আসনটিতে আমার সাময়িক মালিকানা পোক্ত করেছি মাত্র। মানুষ সময় বিশেষে স্বার্থপর হয় এও তার উদাহরন। আবারও ওদের দিকে সাহায্যের আশায় তাকালাম। ষাট বা সত্তর ছাড়ানো দুই নরনারী কোথায় যাচ্ছেন কে জানে? দীর্ঘাঙ্গ দু'জনের মুখায়ব সুন্দর তবে গম্ভীর। অন্তরে মায়া জাগানিয়া বিষন্ন চেহারা এদের। পায়ের ঘন্টা অব্দি কালো স্কার্ট ও মেরুন রংয়ের টপ্‌স পরা মহিলার সুতা ও পুতির নকশাওয়ালা কালো একটি স্কার্ফ দিয়ে মাথা আধ ঘোমটায় আবৃত। ভদ্রলোকের গতানুগতিক পরিধেয় শার্টস্যুট। ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় চারপাশ সম্পর্কে সচেতন। ভদ্রমহিলা অন্তর্লীনা।

আমার তাকানো দেখে ভদ্রলোক উদগ্রীব হলেন কথা বলার জন্য। আমার আসনটি দেখে রাখার অনুরোধ জানানোর আগেই জানতে চাইলেন

'আপনি কি ঘোষনা শুনেছেন?'

'হ্যা, তাইতো যাচ্ছি, জার্নালটা রইলো কেমন।'

'আমার মনে হল আমাকে তারা ডাকছে আর আপনি যাচ্ছেন!'

'আপনাকে কেন ডাকবে?'

‘হ্যা, হ্যা, তাইতো আমাকে কেন ডাকবে আ আ আমিতো...’
ভদ্রলোককে মনে হল দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ আর আনমনা তাই কথা তাই শেষ করতে পারলেন না।
‘আপনার নাম কি?’
‘এ্যারেন আজিজ’
আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম তবে কি ইনার নামই বলেছে? আমি ভুল শুনলাম নাতো?
‘আচ্ছা আপনার কোন ফ্লাইট বলুনতো?’
‘জাগ্রেব, ক্রোয়েসিয়া’
‘নাহ্ তাহলে আপনি নন, আমাকেই ডেকেছে, যাচ্ছি আমি।’
ভদ্রলোক ও সাথে সাথে সেই আত্মমগ্ন নারী চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে স্বস্থি পেলেন যেন। এরা ক্রোয়েসিয়ান মুসলমান মনে হচ্ছে। ইয়োগোস্লাভিয়া না ভাঙ্গলে ধর্ম পরিচয় নিয়ে অতো রক্তারক্তি হত কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য মানুষের চেহারায় ধর্মের নাম থাকেনা থাকে নৃতাত্বিক পরিচয়ের ছাপ। ঐ ছাপ বলছে এরা ইউরোপীয়।
যে জায়গা থেকে ডাক এসেছিল সেখানে পৌঁছে অবাক ও একই সাথে বিরক্ত হলাম। এক সাঁঝি ফুল আর এক বাক্স চকোলেট এক অজানা উপকারীকে আরেক অজানা উপকৃত পাঠিয়েছেন বা রেখে গেছেন। হাতে নতুন বোঝা বইতে হবে ভেবে বিরক্তি লাগছিল।
ফিরে এসে ফুল ও চকোলেট সামনের টেবিলে রাখলাম। ওরা দুজনে তাকালেন। ভদ্রলোকের চোখে ঈষৎ উৎসুক্য, ভদ্রমহিলা তেমনি নির্লিপ্ত।
আমি প্যাকেট খুলে ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক ভদ্রভাবেই জানালেন চকোলেট এখন আর খেতে পারেন না। ভদ্রমহিলা নিলেন একটি তবে খেলেন না। তারপর বিষাদময় সুরে মনে হয় নিজেকেই বললেন,
‘আমার ছেলেও এভাবে আমার সামনে প্যাকেট খুলে ধরতো।’
‘আপনজন থাকলে এয়ারপোর্টেও জিনিস পাঠায় কি মজা।’
বললেন ভদ্রলোক। এবার মনে হল ওদের বলি যে আমার এমন আপন কেউই নাই যে জিনিস পাঠাবে। তাতে হয়তো ওদের স্বজনহীনতার দুঃখ কমলেও কমতে পারতো। আবার ভাবি কি দরকার। আসনটি দেখভাল করেছেন তাই চকোলেটতো দিলামই কথা খরচ কেন অযথা। হাসলাম ওদের দিকে তাকিয়ে।
তারপর ভদ্রলোক উঠে গেলেন কি কারনে যেন। যাওয়ার আগে ভদ্রমহিলাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন। মহিলার কথা শুনে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন মনে হল।
ভদ্রমহিলা আবার নিজের মাঝে ফিরে গেলেন।
ভদ্রলোক যখন ফিরলেন হাতে তার কাগজের গ্লাসে তিন কাপ চা। ছোট্ট বাক্সে চায়ের কাপ বা গ্লাসগুলো বসানো। ভদ্রমহিলা একটি চায়ের গ্লাস তুলে আমার দিকে ধরলেন। আমি চা নিয়ে উনাকে ধন্যবাদ দিলাম। ভদ্রমহিলা তাকিয়ে ছিলেন তবে চোখে তার অপার শূন্যতা।
ভদ্রলোক চা নিয়ে আমাদের মাঝের আসনে বসলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন
‘আপনার আর কতক্ষণ এইখানে থাকতে হবে?’
দূরে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম
‘প্রায় সাতঘন্টা’,
‘দেশে যাচ্ছেন?’
‘না, নাইরোবী যাচ্ছি একটা কাজে। আপনারা ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন?’
ভদ্রলোক অত্যন্ত সাবধানে চারপাশ দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন
‘পালাচ্ছি আমরা, নাম শুনে তাই শংকা হচ্ছিল।’

এ্যারেন আজিজ সপরিবারে পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট এক শহরে নানা জাতের নানা দেশ থেকে আসা লোকের সাথে বাস করতেন। প্রধান শহর নগরের কোলাহলের বাইরে ঐ পাহাড়তলীতে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি ছোটখাটো এয়ারপোর্ট ও স্কুল ছিল একটি। এ্যারেন আজিজ ওখানে অংকের শিক্ষকতা করতেন।
ঐ শহরের বেশীর ভাগ শক্তসবল ছেলেরা স্কুল শেষে সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। সেনাবাহিনীর ধোপদূরস্ত পোষাক, সদম্ভ চলাফেরা ওদের সেনাবাহিনীর জীবনে যোগ দিতে হাতছানি দিয়ে ডাকতো।

এ্যারেন আজিজের একমাত্র ছেলে স্কুল শেষে ঐ হাতছানিতে ধরা দেয়। মেধাবী শক্তসুঠাম ছেলেটি বিমানবাহিনীতে স্থান পাওয়াতে তারা আনন্দিত ও গর্বিত হন। উনিশ বছরের ছেলের প্রথম ছয় বছর বাহিনীতে নির্বিঘ্নে কেটে গেল। বিয়ের আয়োজন শুরু হল আর তখন যুদ্ধও বাঁধলো। যুদ্ধে গেল আর ফিরলো না।
যুদ্ধ দীর্ঘ হল। ঐ শহরের আরও অনেকজন যুদ্ধে গেল]
সামরিক প্রশিক্ষনকেন্দ্র থাকাতে ঐ শহরে অনেক সামরিক পরিবারের বাস ছিল।
এ্যারেন আজিজের একসময়ের ছাত্র ডেভিড তেমনি এক পরিবারের ছেলে। তার বাবাও সামরিক বাহিনীর পদস্থ ডাক্তার।
এ্যারেনের ছেলের মৃত্যুতে এই শহরে শোকের বাতাস বয়ে গিয়েছিল। ডেভিড তার বাবার সাথে এসেছিল তার সাথে দেখা করতে। কোনকথা বলেনি কেউ।
নীরবতা দিয়ে একজন আরেকজনের শোকতপ্ত হৃদয় ছুঁতে চেয়েছে মাত্র।

এ্যারেনকে ডেভিড খুব পছন্দ করতো। বেশ ক'বছর আগে উনি ইংরেজী ওয়াই অক্ষরের মত দেখতে কাঠের একটি ইলাষ্টিক লাগানো সাধাসিধা খেলনা এনে তা দিয়ে শিখিয়ে ছিলেন কি করে ম্যাগপাই তাড়াতে হয়। ওরা বন্ধুরা মিলে ঐ খেলনা চালিয়ে স্কুল মাঠের আশপাশ থেকে ম্যাগপাই তাড়িয়েছে।
পাহাড়ী শহর বলে ম্যাগপাই আসেও একটা সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। এরপর থেকে প্রতিবছরই ম্যাগপাই নামার সময়ে এ্যারেন ঐ খেলনা ওদের দিয়েছেন ও ব্যবহারও শিখিয়েছেন। হাসিখুশী এই শিক্ষক সদাই খোশমেজাজী। অংকও ভাল বুঝাতে পারেন। ছাত্রদেরও খুব প্রিয়। চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পরও ডেভিড আসতো মাঝে মাঝে। সে জানে আগামী বছর ও হাইস্কুলে গেলেও ঐ ওয়াই খেলনা সে একটা উপহার হিসাবে পাবে।
আজ এ্যারেনের চেহারা দেখে সে এত দুঃখীত হল যে বাবাকে কানে কানে বললো
'বাবা ওর হাসিটা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে মনে হয়।'
তারপর ডেভিড জানতে চেয়েছিল
'আমাদের সীমান্ততো কেউ হামলা করেনি তবে আমরা কেন যুদ্ধ করছি?'
ওর বাবা আপন মনে নিজের থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলেন
'হ্যা, এ অন্যায়, ভারী অন্যায়]'
এরমাঝে ডেভিডের বাবারও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ডাক এসে গেল। বিষাদ নামলো বিদায় আসন্ন জেনে। ডেভিডের বাবা এক কান্ড করে বসলেন। শহরের আলোচ্য বিষয় এখন একটাই তা হল ডেভিডের বাবার কি হবে এবার। যুদ্ধে না গেলেও সে বাঁচবে কি? কোর্ট মার্শাল হবে কি তার?
ডেভিডের বাবার কোর্ট র্মাশালে সাজা দেওয়া হবে শুনা যাচ্ছে। ডেভিডের বাবাকে সামরিক দপ্তর থেকে বাড়ীতে আসতে দেওয়া হচ্ছেনা আর। শহরে জোর গুজব যে ডেভিডের বাবাকে সামরিক বাহিনীর প্রধান দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য।
এরমাঝে ডেভিড আসে প্রিয় শিক্ষকের কাছে কয়েকবার। চুপচাপ বসে থাকে পাশে। তারপর একসময়ে নীরবে চলে যায়।
তেমনি একদিন এসে সে জানালো 'আমার বাবাকেও ওরা আর আসতে দিচ্ছেনা, 'তোমার কি মনে হয় বাবাকে জোর করে যুদ্ধে পাঠাবে?'
এর জবাব এ্যারেনের জানা ছিলনা। উনি তাই চুপই রইলেন। এরপর ডেভিড বললো
'পাখি তাড়ানোর ঐ ওয়াই(y)গুলো কি দেবে? গতকাল ম্যাগপাই স্কুলমাঠে একটি ছেলের কান ঠুকরে রক্ত এনেছে। বন্ধুরা মিলে পাখি তাড়াবো।'
এ্যারেন আজিজ ওর হাতে পুরো এক ডজন পাখি তাড়ানোর গুলতি তুলে দিলেন। ডেভিড বললো
'আমরা মার্বেল দিয়ে পাখিকে তাক করবো।'
দু'দিন পর ছুট্তে ছুট্তে ডেভিড এলো খবর নিয়ে।
'আজ রাতে আমার বাবাকে প্লেনে করে বিচার করতে দূরে নিয়ে যাবে। দেখা করতে গিয়ে মা কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছে।'

সেইরাতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। ট্রাফিক লাইট সব একে একে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে ভেঙ্গে পড়লো। তারপর রাস্তার লাইটও ভেঙ্গে পড়লো সব। ট্র্যাফিকজ্যামের হুলুস্থুল শুরু হল। ছোট্টশহর মূহূর্তে অন্ধকার ভুতুরে হয়ে গেল। ঐ রাতে প্লেন আর উড়লোনা। শহরে কানাঘুষা যে লাইটভাঙ্গা বোধহয় সন্ত্রাসী কাজ। পুলিশ খুঁজেপেতে কতগুলো মার্বেল পেয়েছে। কোন বন্দুকে ঢুকিয়ে মার্বেল মারা হল তাই পুলিশ জোরে সোরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শব্দহীন বন্দুক কোথায় পাওয়া যায় তাও জানতে উদগ্রীব তারা।
এ্যারেন দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। ঐ পাখি মারার গুলতি তাকে দিয়েছিল তার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু। উনি তাকে ঘটনা জানালেন। সেই ভদ্রলোক সব শুনে ভয়ে প্রায় নির্জীব। বললেন
‘পালাও, পালাও, তোমার ছেলেও যুদ্ধে মারা গেছে তাই ওরা ধরে নেবে তুমিই উস্কানি দাতা’।